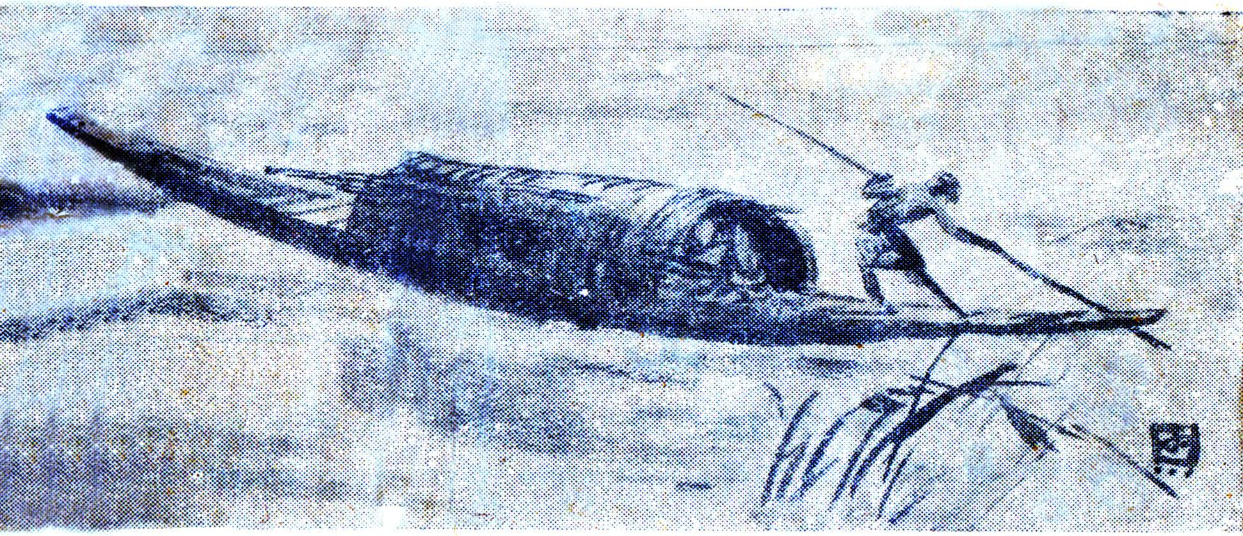
সবুজ সেনা

(সচিত্র কিশোর মাসিক)



[illegible]রাব সবুজ সেনার প্রকাশনা

বৈশাখ
১৩৬৪



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সবুজ সেনা

(কিশোরদের সাহিত্য মাসিক)

৫০, লালবাগ রোড,

ঢাকা।

সূচী

নিয়মাবলী

* সবুজ সেনার প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হবে।

* খ্যাতনামা লেখক লেখিকা ছাড়াও কিশোর কিশোরীদের লেখা গল্প কবিতা প্রবন্ধ ও নাটিকা এতে ছাপা হবে।

* লেখা কাগজের এক পিঠে পরিস্কার ভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ডাকটিকেট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না।

* সবুজ সেনার প্রতি সংখ্যা ।০ আনা, বিশেষ সংখ্যার দাম হবে ॥০ আনা, বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সহ সাড়ে তিন টাকা। ষান্মাসিক দুই টাকা।

* বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলবে। গ্রাহক হওয়ার চাঁদা ম্যানেজার সবুজ সেনা, ৫০, লালবাগ রোড, ঢাকা ঠিকানায় পাঠাতে হবে।



প্রথম বর্ষ : বৈশাখ, ১৩৬৪ : প্রথম সংখ্যা

একতা

বেগম সুফিয়া কামাল

ক্ষুদ্র তুচ্ছ বালু কণা
সৃজিছে পর্ব্বত
পদে পদে গড়ে ওঠে
প্রসারিত পথ।

তৃণে তৃণে শ্যাম করে
উষর প্রান্তর
বিন্দু বিন্দু বারি লয়ে
বহিছে সাগর।

পুষ্পে পুষ্পে গাঁথা হয়
জয় ও যশ মালা
অঞ্জলী ভরিয়া দানে
পূর্ণ করি ডালা।

পাঁচটী ইন্দ্রিয় নিয়ে
মানবের দেহ
অঙ্গ হীন হয় কেহ
করিলে বিদ্রোহ।
মহা কাব্য রচা হয়
অক্ষরে অক্ষরে
উড়িতে পারে না পাখী
এক পক্ষ ধরে।
সমবেত শক্তি নিয়ে
যে জাতি মহান
সমগ্র বিশ্বের মাঝে
লভে সে সম্মান।

বড় হওয়া

॥ জয়নব কুলসুম ॥

কোন এক সময় বাপের হয়ত সখ ছিল কিছু একটা হবার। দশ বছর পর হঠাৎ সে সবই এসে দেখা দিলো ছেলের মধ্যে। বয়সে বড় হোতে না হোতে বড় হওয়ার সখ যেন হেহুর চাগিয়ে উঠলো। বাবার কাছে বললে এসে: বাবা আমি তেনজিং হবো।
: তা বেশ বেশ! হোতে আর বাধা কি! আজ থেকেই হ'না। মুখে বললেন এই কথা —বলে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। সে রকম সম্ভাবনা সত্যি আছে কি না ছেলের মধ্যে। না: তেমন কোন কোন ছাপ নেই। কিন্তু প্রতিভা অনেক সময় লুক্কায়িত অবস্থাতেও তো থাকে। বস্তুত: ছেলের এই ভাবী স্পষ্টবাদিতায় খুশী হোলেন যথেষ্ট। খুশির আতিশয্যে চড়ের অপভ্রংশ প্রহারে চাপড়ে দিলেন তার পিঠকে। হেহুর মাকে বললেন: দেখলে—হেহুর আমার কি উচ্চাশা। এই বয়সেই এত বড় হোলে না জানি কি—। আড়ালে তাই শুনে গাছে আর চুড়ায় চড়বার জন্য হেহুর পুন: পুন: অভিযান বাড়লো বৈ কমলো না। সত্যিই কি তেনজিংয়ের তেমন কোন প্রতিভা তার মধ্যে আছে? বড় হোয়ে তার মত বড় সে হোতে পারবে তো? পার্ব্বত্য শিলাবৃষ্টির মত] অজস্র উই পোকার কামড় খেয়ে উপটিপি সফরও কম করলে না।

এদিকে দাদুভাই দেখে ডাকলেন তার নিজের কাছে। দাদু সেই সেকেলে মানুষ—হেহুর এমন (হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা) ভাবও পছন্দ করেন না, বুঝিয়ে তাই বললেন: কাজ কি দাদা তেনজিং হোয়ে। জয় যে করবে সে হিমালয় এদেশে থাকলে তো—।

হেহু বুক ফুলিয়ে বলে: কেন ওদের হিমালয়ই জয় করবো। 'না: ভাই পরের হিমালয় জয় করে কাজ নেই। নিজের দেশে একটা আধটা থাকলেও হোত। কিন্তু দাদু জানেন যে হিমালয় পৃথিবীতে একটিই হয়। ওদিকে হেহু কি ভাবলে সেই জানে। পরদিনই বাপকে বললে: বাবা আমি আলেকজাণ্ডার হব। বাবা অবাক হোয়ে বললে: কেন তেনজিংয়ের কি হল? : 'হবে আবার কি। হিমালয় তো ওরা জয়ই করেছে। ফের আমি করলে কেউ নাম করবে কি? —'তা অবশ্যঠিকই' বাবা তার দুর্লভ টাকটি নাড়িয়ে কথার মর্ম্ম উদ্ধার করলেন, বললেন: বেশ হোগে আলেকজাণ্ডার। যুদ্ধ যা হোচ্ছে দুনিয়ায় তাতে একটি হিমালয় জয় করবার জন্য হাজারটি তেনজিং না লাগুক কিন্তু

একটি যুদ্ধ জয় করাতে লক্ষটি আলেকজাণ্ডার তাতে নির্ঘাত লাগবে'। তারপর চললো হেদুর—দিনে কতটা বন উপবন কচু কাটা করলে,—শেয়াল ছানা, তাড়িয়ে বাগদাশা মেরে হাঁস মুরগীর দুর্গম স্থান সুগম করে তুললে—তার আর ইয়ত্তা নেই। হেদুর বাবা গোপনে ডায়েরীতে লিখলেন : শ্রীমান হেদু অদ্য দু'টি আরশুলা হত্যা করিল। বাড়ীর হংস-বৎসকে শৃগালের গ্রাস হইতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিল। শূকর ছানা দুইটাকে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনে গন্ধর্ব্ব ছুটানো ছুটাইয়াছে। উপরি-উক্ত ঘটনা সকল দর্শনে আমরা তাহার বিরাট ভবিষ্যৎ মানসপটে অতি উজ্জলরূপে অবলোকন করিতেছি। শীঘ্রই আশা করিতেছি যে সে বড় হইয়া সত্যকার আলেকজাণ্ডার হইবে।

ওদিকে হঠাৎ একদিন হেদু এসে জানাল : বাবা আলেকজাণ্ডার আমি হব না : : সেকি আলেকজণ্ডার আবার কি দোষ করলে? : ইতিহাসে লেখা আছে আলেকজাণ্ডার অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। : আহা! অতবড় যে বীর—নিষ্ঠুরতা তার সাজেই। হেদু নির্বিবাদে বললে : তবে বাবা আমিও নিষ্ঠুরতা করে বাড়ীর একটি চিনে মুরগী হত্যে করেছি'। —'এ্যা—শুনে বাবার আক্কেল গুড়ুম। এই সেদিন বুঝি ওটা কিনে এনেছিলেন। রোজ সকালে ডিম একটি দান করায় প্রাতঃ ভোজনেও বেশ পরিপাটিতা এসে গিয়েছিল। এখন বলে কি ছেলেটি। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন যে ছেলে তাকে তো আর মারাও যাবে না ঠিক। থাকৃগে নাইবা মারলেন। তুচ্ছ টাকা তার চেয়ে বড় এই প্রতিভা। বাপ তাই মারলেন ও না বকলেন না—কিছুই না। শুধু দু দুবার মা বুঝি রুদ্র মূর্ত্তিতে তেড়ে এলেন।

হেদুর বাবাই থামিয়ে দিয়ে বললেন : রাখো রাখো—বোঝ না সোঝনা ওমনি মারতে এস। কেন বাপু ছেলে তো তোমার আর দু'দিন পরেই দশের একজন হোচ্ছে—হ্যা—হোলে বলবে যে এই ছেলেকে তো একদিন তুচ্ছ কারনে মারতে গেছলু। বলি তখন মুখ থাকবে কি? তারপর ছেলেকে ও বললেন : হ্যারে কি হবি? হেদু কোন চিন্তা না করেই উত্তর দিলে : চিন্তাশীল আইনষ্টাইন বাবা'। : 'এ্যা! একেবারে আইনষ্টাইন? হেদু বলে : হ্যা বাবা মা বলছিল কাল কেন অত চিন্তা করছিলাম? আসলে মা জানে না যে'—শেষের কথা ভেবো না যে, চিন্তায় আটকে গেল।... আসলে লজ্জায় আহা! অতবড় একটি জীব হত্যে করে কারই বা না চিন্তা হয়। মিথ্যে কৈফিয়ত সাজাতে গেলে। যার জন্যে এটা আইনাষ্টাইন চাল নয়। একটু চালিয়াতি ব্যাপারই ঘটলো সেখানে। কিন্তু বাবার চোখে হেদুর এই অন্যমনস্কতা নিখুঁত হোয়ে আটকে গেল। মনে মনে টুকে রাখলেন—সত্যি আইনষ্টাইন হবে। মা রেগে যান : 'কি যে হোয়েছে আজকাল তোমাদের

অপরাধ করলো কোথায় মারবে। যা হোলো গোঁড়া গোছের। হেছুর এই বড় হওয়ার মর্ম্ম কি বুঝবে! বেচারা হেছু! ফের অন্যমনস্ক না হলে মাকে একথা বুঝিয়ে দিত ঠিক। তার বাবা জানে: এই একটি মার জন্যে তার ওমন বড় হবার প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তে ভেঙে গেছিল। এখন যদি ছেলের বেলায়ও তাই হয়—না না তা কেন হোতে দেবেন তিনি। বাংলার একটি উজ্জল মনি—হেছুকে মারতে হেছুকে বকতে আর তার কাছে যেতে মার যেটুকু অধিকার ছিল হেছুর বাবার কড়াকড়ি নিয়মে আজ থেকে তা দূর হোলো। নিরুপায় মা দূর থেকেই যা একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করেন তাছাড়া ত্রিসিমানা বলতে এক পা কাছে এগুতে পারেন না। অবশেষে রাগ করে এসবের তথ্যোৎদ্ঘাটন করলেন: 'তোমার ছেলে চিন্তা করে না ছাই করে। জানো রাতদিন টেবিলে পা তুলে দিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে। দশবার তো মানা করছো—এটা করোনা ওটা করো না—করলে হেছুর ডিষ্টার্ব হবে—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি আড়ালে বদ্ধ ঘরে থেকে থেকে হেছু কি ঘুম কাতুরে হোয়েছে। হেছু আইনষ্টাইন হবে না আরো কিছু। কথাটা কেমন মনে ধরে গেল বাবার। তাইতো ছেলেটার সারাদিনের মধ্যে একটু চুঁ শব্দ পাওয়া যায় না। নীচেও বড় একটা নামেনা। খাওয়ার সময়ই যা একটা দেখা যায়। চোখ দুটিও নজর করলে কেমন ফোলা ফোলা দেখায়। সেদিন হঠাৎ—'হারে হেছু'? হেছু তার আগেই চলে যাবার জন্যে পা বাড়াবার মুহূর্ত্তে উত্তর দিলে: 'হ্যা বাবা আর আমি আইনষ্টাইন হচ্ছি নে। চিন্তায় আমার ঘুম আসে—কম সে কম বিরাশি ঘন্টা ঘুমিয়েছি—বত্রিশ রকম স্বপ্ন দেখেছি—পক্ষীরাজ ঘোড়ার—ডিম কিছু বাদ নেই-সব ছেলের বাবাদের রমনার মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। আরো কতদিন থাকলে হয়তো নিলডাউন, নাকে খৎদেওয়াও দেখে আসতুম। কাজ কি বাবা ওসব মিছেমিছি কেলেঙ্কারীর বা আইনষ্টাইন নির্ঘাত যে গুরুজনদের কান ডলে দেয়নি—তাই বা হলফ করে বলবে কে! থাক গে যেতে দাও—এবার আমি দস্যু মোহনই হব। বার বার এই শেষবার। —তুমি দেখে নিয়ো বাবা নারীত্রাতা দাতা মোহন যদি না হই তো বলেছো কি!—সবশুনে আতকে ওঠেন মা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বললেন: ওগো শেষকালে তোমার ছেলে দস্যু হবে? মার ভয় দেখে বাবা বিরক্তে খিচিয়ে ওঠেন: 'তুমি শুধু মোহনের দস্যুতাই দেখলে। ওর পরোপকারীতা, দাতাগিরি এসব কিছু নজরে আটকালো না। ওরা কি দস্যু—দেবতা। এমন লোক আর হয়? আমার হেছুমনিও যদি —' শেষের কথা গদ গদ হোয়ে আসে বাবার ... ... আর শুনতে হোল না। হেছুমনি পর্ব্বতপ্রমান গর্ব্ব বুকে বয়ে নিয়ে শীগগীর সে স্থান পরিত্যাগ করলে।

আর বলতে—হেছুর সত্যি বড় একটা কিছু হওয়ার সুদিন এসে গেছে। শুধু আর ... ... আর কটি দিন তার পরেই ··· ... তলোয়ার ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কামান বন্দুক

তোমারে দেখি তারকার চোখে

॥ জাহান আরা ॥

খুঁজে ফিরি আজ হৃদয়ে বাহিরে
এসো তুমি এসো প্রভু,
ফেলিতে না চাই হারাতে না চাই
ভুলেও তোমাকে কভু।
অসীমের মাঝে তোমার সকলি
গোপনে রেখেছো ঢেকে,
সুনীল আকাশে লম্পটের' পরে
রেখেছো নয়ন এঁকে।
রাতের আঁধারে আখি তারকায়
ঝিলি মিলি আলো-রেখে,
আমার চোখের পাতায় পাতায়
পেয়েছি তোমার দেখা।
সীমাহীন ওই তারকার চোখে
দাও প্রভু দাও আলো,
আমার আকাশে—আমার বাতাসে
তোমারই সুর ঢালো।

ছুড়ে রাজা মহারাজার মত সারাদেশে ঘুরে বেড়াবে। এদেশের অত্যাচারী লোকেরা সব ভয় পাবে তাকে যমের মত—

ডজন খানেক ডন দিয়ে—অজস্র কিল ঘুষি দেওয়ালে ঠুকে নিজের ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে নিলে। শক্তি সম্বন্ধে এতদিনকার অজ্ঞতা প্যাকাটে শরীরর থেকে এক মুহূর্ত্তে উবে গেল তার। মোহনের দুর্জ্জয় স্বপ্ন দুচোখের মনিতে আগ্নেয়গিরীর মত জ্বলতে থাকে। দাঁতে দাঁত ঠুকে আপণ মনেই পায়ন্তারা কষতে কষতে বিড় বিড় করে উঠলে : ইঃ বাবার এত ধন এত টাকা ...... অথচ কাউকে দেবে না, দান করবে না। কেন ?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



কিস্‌সা-কাহিনী

দুই বোন

॥ চৌধুরী ওস্‌মান ॥

তারা দুই বোন। একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে তাদের বাড়ী। ওদের মা অত্যন্ত নোংরা এবং অহংকারী। বড় বোন অবিকল মার স্বভাব পেয়েছিল; কিন্তু ছোট বোন ছিল পিতার মত বিনয়ী ও নম্র। তা ছাড়া সে ছিল অপূর্ব সুন্দরী।

মা বড় বোনকে অত্যন্ত ভালবাসতো, কিন্তু ছোট বোনকে দুচোখে দেখতে পারতো না। তাকে রান্না ঘরে খেতে দিতো আর ভারী ভারী কাজ করাতো। দেড় মাইল দূর থেকে দিনে দুবার তাকে পানি আনতে হতো।

একদিন কূয়ো থেকে পানি তুলবার সময় একজন দরিদ্র স্ত্রীলোক তার কাছে এসে পানি চাইলো। অত্যন্ত বিনয়ের সংগে সে তৎক্ষণাৎ তাকে পানি পান করতে দিলো।

পানি পান করে স্ত্রীলোকটি বল্‌লো: তুমি আমার যে উপকার করলে, এরজন্য আমি তোমায় একটি পুরুস্কার না দিয়ে পারি না। কারণ, সে একজন ছদ্মবেশী পরী।

: আমি তোমাকে এই পুরুস্কার দিচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেক কথার সাথে মুখ থেকে ফুল আর মুক্তো ঝরবে।—পরী বললো।......

যখন বালিকা বাড়ী পৌঁছলো, মা এই বিলম্বের জন্য তাকে জেরা করতে লাগলো।

: মা, আমাকে মাফ করো, আর কখ্‌খনো দেরী হবে না—কথা বলার সংগে সংগে তার মুখ থেকে ঝরে পড়লো কতকগুলো ফুল ও মুক্তো।

: একি! তোমার কি হয়েছে, বাছা? —এই প্রথম মা তাকে বাছা বলে সম্বোধন করলো।

হতভাগ্য বালিকা পরীর কাহিনী সমস্ত খুলে বল্‌লো। এবং তার কথার সাথে সাথে ঝরে পড়লো আরো অনেকগুলো মুক্তো ও ফুল।

: আহ কি মজা। মা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—আমি এখখুনি আমার মেয়েকে কুয়োয় পাঠাব। মা ফ্যানী, এদিকে এসো। দেখ, তোমার বোনের মুখ থেকে কি সুন্দর মুক্তো বেরুচ্ছে। তুমি কি এরূপ পুরস্কার চাও না। তোমাকে একটিবার কুয়োয় যেতে হবে।

: কি তুমি আমাকে দিয়ে পানি আনাবে? আমি তা' কখখনো পারবো না, মা।—বেয়াড়া মেয়েটি উত্তর করলো।

: তোমাকে যেতেই হবে এবং এই মুহূর্তেই—মা দৃঢ়কণ্ঠে বললো।

অতএব সে বাধ্য হয়ে বক বক করতে করতে রূপোর ঘড়াটি নিয়ে রওয়ানা হলো।

কুয়োর কাছে যেতে না যেতেই জংগল থেকে বের হয়ে এলো সুন্দর পোষাক পরা এক মহিলা। সে মেয়েটির কাছে এসে পানি চাইলো। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এ সেই পরী। সে এই মেয়েটিকে পরীক্ষা করবার জন্যই এমনি রূপ ধরে এসেছে।

: আমার আর কাজ নেই, আমি তোমাকে পানি খাওয়াতে এসেছি, না? দাম্ভিক মেয়েটি উত্তর করলো।

: তুমি ভদ্রতা মোটেই শিখ নাই—পরী রাগলো না মোটেই—তোমার এই অভদ্র ব্যবহারের জন্য আমি তোমাকে এই পুরস্কার দিচ্ছি যে, তোমার কথার সংগে সংগে মুখ থেকে যেন সাপ ও ব্যাঙ বেরোয়।......

মা তাকে ফিরতে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে দৌড়ে এসে বল্লো: এতক্ষণে এলে মা?

: হ্যাঁ, মা—উত্তরের সংগে সংগে দুটো ব্যাঙ ও দুটো সাপ বেরিয়ে এলো।

: একি!—মা চীৎকার করে উঠ্লো ভয়ে—হায়, হায়, এ নিশ্চয়ই ঐ ডাইনী মেয়ের কাজ। আচ্ছা দাঁড়াও—মজা দেখাচ্ছি।—বলে সে ছোট মেয়েকে মারতে দৌড়ালো।

হতভাগী বালিকা জংগলে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। এক রাজপুত্র ঐ জংগলে এসেছিল শীকার করতে। সে বালিকাকে দেখতে পেল। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো যে সে একাকী এই অরণ্যে বসে কাঁদছে কেন?

: মা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজপুত্র দেখতে পেল মেয়েটির কথার সংগে সংগে কয়েকটি মুক্তো ঝরে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো তার মা কেন তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে।

বালিকা আগাগোড়া কাহিনীটি বলে গেল। রাজপুত্র তাকে দেশে নিয়ে বিয়ে করলো।

আর তার বোন? তাকেও মা প্রহার করে তাড়িয়ে দিল। কিছুদিন নানা জায়গায় ঘুরে কোথাও স্থান না পেয়ে ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে বনের ধারে পড়লো ঘুমিয়ে, সেখানেই তার মৃত্যু হলো।

(প্রচলিত কাহিনী)



বাঘ মারাটা সহজ ব্যাপার

॥ মীর মোশাররফ হোসেন ॥

"বাঘ মারাটা সহজ ব্যাপার
সত্যি বলি সুনিশ্চয়,
আরো এটা সহজ হবে
হাতে যদি গুলতী রয়।"
ছন্দ মুখর সন্ধ্যাকালে
বিষ্টি যখন পড়ছে তালে
বল্‌লো তখন গোঁচ পাকিয়ে
রায় বাজারের বাচ্চা জান,
তিনি নাকি জ্যান্তো বাঘের
কল্‌জে ছিঁড়ে আস্তা খান।
সন্তু, দীপু, গণশা সবাই
ভয়ে ভয়ে দিচ্ছে যে হাই
বাপ্‌রে বাবা বাচ্চা মিয়া
যেমন তেমন নয়কো বীর,
এক চাপড়ে মারবে যে বাঘ
ল্যাঙ মেরে যে ভাঙ্গবে শির।

এমনি সময় পেলাম ধোঁকা
একটা বড় তেলে পোকা
ওপর থেকে পড়লো এসে
বাচ্চা মিয়ার ঘাড়ে,
আর কোথা যায় বাঘ শিকারী
হলো ভীষণ ছাড়ে।
অবশেষে কান্না আসে
বাচ্চা মিয়া ভিজ্‌ছে ঘামে
বল্‌লো শেষে বাঘ মারাটা
কঠিন ব্যাপার সুনিশ্চয়,
হাসি খেলা নয়কো এটা
প্রাণ বাঁচানো বিষম দায়।



চুয়াঙের উপকথা

অনুবাদক : সন্তোষ গুপ্ত

সে অনেক দিন আগের কথা।

বেশ উঁচু একটা পর্বতের উপত্যকার এক গাঁয়ে এক বুড়ী বাস করত। বুড়ীর নাম তানপু। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিন ছেলে নিয়ে থাকত এক কুঁড়ে ঘরে। বড় লেমী, ছোট লাতুই আর সবচেয়ে ছোটটির নাম ছিল লেজি।

এই চুয়াঙ গাঁয়ের লোকেরা সবার সেরা সোনারূপার কাজ করা রেশমী কাপড় বুনত। তবে তাদের এতই খ্যাতি ছিল যে এগুলি বিশেষ ভাবে চুয়াঙের কিংখাব নামে পরিচিত। এদের মধ্যে তানপু ছিল সবার সেরা। কিংখাবের ওপর তার তোলা ফুল, লতা-পাতা, পাখী আর জীবজন্তু হুবহু জীবন্ত বলে মনে হত। তার তৈরী কিংখাপ বিক্রি হত প্রচুর পরিমাণে—আর এগুলি দিয়ে ওয়েষ্ট কোট, লেপের ওয়াড় আর বিছানার চাদর তৈরী হত। বলতে গেলে চারটে মুখ তার একার কাজেই খেয়ে পরে থাকত।

এই ভাবে দিন যায়, একদিন কি হল জানো তানপু শহরে গেল, উদ্দেশ্য কিংখাব বিক্রি করে চাল কিনবে। হঠাৎ শহরের এক দোকানে সে সুন্দর রঙীন একটি ছবি দেখতে পেল। উঁচু প্রাসাদ, সুন্দর প্রাঙ্গন, মনোরম উদ্যান, বিরাট শস্যশ্যামল প্রান্তর, ফলফলাদি ও সব্জীর বাগান আর পুকুর সব মিলিয়ে এক সুন্দর ছবি। সমস্ত রকম জন্তু জানোয়ার, নাদুস নুদুস মুরগীর বাচ্চা, হাঁস, গরু-ছাগল ভেড়া আরো কত কি আছে। ছবি দেখে দেখে তানপুর আর আশা মেটে না। মনে তার এক অদ্ভুত আনন্দ জাগল। তার এত ভাল লাগল ছবিটা যে সে এটা শেষ পর্যন্ত কিনেই ফেলল। ফলে তার আর বেশী চাল কেনা হল না।

রাস্তায় চলতে চলতে সে কিছুক্ষণ থেমে ছবিটা দেখে নেয়। বিড় বিড় করে সে বলতে থাকে, "আহা যদি, এমন একটা বাড়ীতে থাকতে পারতাম।"

বাড়ীতে গিয়ে সে ছেলেদের ছবিটা দেখাল। তাদেরও ভাল লাগল খুব।

বড় ছেলে লেমকে সে বলে, "কি মজাই না হত—যদি এরকম একটা বাড়ীতে আমরা থাকতে পারতাম, কি বল লেমি ?

"আম্মার যত সব আছে বাজে কল্পনা,"—লেমি ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল।

তানপু তখন দ্বিতীয় ছেলেকে বলল, "যদি এর কম একটা বাড়ীতে থাকতে পারতাম, লাতুই।

"আম্মা, বেহেশ্‌তে যাও, তারপর," লাতুই বিদ্রূপ ভরে হেসে উঠে।

তানপু ভ্রূকুটি করে তৃতীয় ছেলের দিকে ফিরে বলে, "যদি এরকম বাড়ীতে থাকতে না পারি, লেজি তা'হলে হয়ত আমি মরে যাব দুঃখে।" তার বুক চিরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

মাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে লেজি ভাবতে থাকে। তারপর সে মাকে বলে, "আম্মা তুমিত চমৎকার কিংখাব বুনতে পার, আর যে প্যাটার্ণগুলো তুমি তোল তা কী চমৎকার জীবন্ত। তবে এই ছবিটা তুমি বুনে ফেল না কেন? যখনই এর দিকে তাকাবে তখনই মনে হবে যেন এরকম একটা বাড়ীতেই আছি।

তানপু কিছুক্ষন ভেবে ঠোঁটের ধারে চুক্‌ চুক্‌ করে একধরণের শব্দ করে বলল, "ঠিক কথা এরকম একটা কিংখাব বুনব, নতুবা নির্ঘাত মারা যাব।

তারপর সে নানা রঙ বেরঙের রেশমী সুতা কিনে, তাঁত চালিয়ে কিংখাবের ওপর ছবিটা তুলতে লেগে গেল।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস সে বুনে চলল।

লেমি আর লাতুই মায়ের ওপর ভারী অসন্তুষ্ট হল, এমন কী, কখনো কখনো গজর গজর করতে করতে ভাত থেকে মায়ের হাত সরিয়ে দিত।" সারা দিনভর বসে বুনবে তবু বিক্রি করবেনা। কাঠ কেটে আমরা যে টাকা পাই তা থেকে চাল কিনে তোমাকে খাওয়াচ্ছি। এদিকে কাঠ কেটে কেটে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম।

কিন্তু লেজি বলল, "আম্মাকে, কিংখাব বুনতে দাও, সুন্দর ছবিটা না তুলতে পারলে মনের দুঃখেই আম্মা মরে যাবে। যদি কাঠ কাটতে তোমাদের এত ক্লান্তিই লাগে তবে আমি একাই সব কাঠ চেলাই করব।"

তখন থেকে সমস্ত পরিবার তার কাঠ চেলাই এর ওপর চলত। এজন্য তাকে সারা দিনরাত কাজ করতে হত।

দিনরাত ধরে তাঁত চালাত। রাত্তিরে আলোর জন্য দেবদারুর ডাল জ্বালাত। ধোঁয়ায় তার চোখ লাল টক্‌ টকে হয়ে ওঠে। তবু তার বিরাম নাই। একটা বছর চলে গেল কিংখাবের ওপর তার চোখের জল টপ্‌ টপ করে পড়তে থাকে। এগুলোতে সে টল্‌টলে স্বচ্ছ নদী আর গোলাকার পুকুর বুনে ফেলল। দুই বছর পরে, এর ওপর তার চোখ হতে রক্ত পড়ল দুটো ফোঁটা, এই রক্তের ফোঁটাগুলো দিয়ে সে ফুটিয়ে তুলল জ্বল জ্বলে লাল সূর্য আর উজ্জ্বল রঙীন ফুল।

তার বোনার আর বিরাম নাই। তিন বছরে তার কিংখাবটা বোনা শেষ হল।

মরি, মরি, কী সুন্দর চুয়াঙের এই কিংখাবের টুকরোটি!

এটাতে সবই রয়েছে। সুন্দর প্রাসাদমালা, নীল টালির ছাদ, সবুজ দেয়াল, লাল স্তম্ভ আর হরিদ্রাভ তোরণ। প্রাসাদের সামনে সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর ফুল আর সোনালী মাছগুলো ফিরছে পুকুরে পুষ্প দুলিয়ে। বাঁ দিকে ফলের বাগান। গাছে গাছে পাখী গান করছে যেন মনে হয়, লাল আর কমলা রঙের ফলে গাছ ভর্তি। ডান দিকে বাগান। প্রচুর সবুজ আর হলদে শাকসব্জীর সমারোহ। পিছন দিকটাতে সবুজ মাঠ। গরু, ভেড়া, চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। হাঁস-মুরগী, পোকা খুটে খুটে খাচ্ছে। মাঠের একদিকে ভেড়ার খোঁয়াড়, গোশালা আর হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড় চোখে পড়ে। পাহাড়ের সানুদেশে প্রাসাদের অদূর বিরাট মাঠ ভর্তি সোনালী ধান আর গম। স্বচ্ছ নদী বয়ে চলেছে প্রাসাদের সামনে আর আকাশে লাল টক্ টকে সূর্য আলো দিচ্ছে।

"মরি, মরি, কী সুন্দর," তিন ছেলেই আনন্দে কলরব করে ওঠে

তানপু শুয়ে পড়ে, দু'হাতে লাল চোখো দু'টো রগড়ে নেয়। তার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি, এতক্ষণে আনন্দে সে জোরে জোরে হাসছে।

তারপর হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই পশ্চিম থেকে এক দমকা হাওয়া এল। আরে দেখ—দেখ কিংখাব উড়ে একদম দরজার বাইরে চলে চাল সোজা উড়ে চলল পূবদিকে।

বিদ্যুৎরেখার মত দু'হাত বাড়িয়ে তানপু ছুটল পেছন পেছন। সে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল কিন্তু হায়। চোখের পলকে কিংখাব দৃষ্টির বাইর চেলে গেল।

বেচারা তানপু দরজার বাইরে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

তিন ভাই ধরাধরি করে তাকে ঘরের ভিতর এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। তাকে আদার রস তারা কিছুটা খাইয়ে দিল। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল। বড় ছেলেকে ডেকে সে বলল, লেমি পূর্বদিক হতে আমাকে কিংখাবটা খুঁজে এনে দাও। ওটি জীবনের চেয়েও প্রিয়।"

লেমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর খড়ের চটি পরে পূর্বদিকে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে একমাস পরে সে একটা গিরিবর্ত্মের কাছে এসে পড়ল।

গিরিপথের মুখে একটা পাথুরে ঘর আছে। ডান দিকে একটা পাথরের ঘোড়া দাঁড়িয়ে। মুখটা তার হাঁ করা। পাশেই লাল জাম ধরেছে গাছে। যেন ঘোড়াটা এগুলো খেতে চাচ্ছে। ঘরের সামনে এক বুড়ী বসে রয়েছে। মাথা ভর্তি সাদা চুল। লেমিকে দেখেই বুড়ী বলল, "বাছা, কোথায় চলেছ?"

লেমি জবাব দিল, "আমি চুয়াঙের কিংখাব খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার মা তিন বছর ধরে এটা বুনেছে। একটা দমকা ঝড়ে এটা পূবদিকে উড়ে গেছে।"

বুড়ী বলল, "পূর্বের সূর্য্যি পাহাড়ের পরীরা কিংখাবটা নিয়ে গেছে। এটা এত চমৎকার ভাবো বোনা হয়েছে যে তারা এটাকে নমুনা ধরে কিংখাব বুনতে যাচ্ছে। কিন্তু ওখানে যাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। প্রথমে তোমাকে দুটো দাঁত উপড়ে ফেলতে হবে। তারপর সেই দাঁত দুটো আমার পাথুরে ঘোড়াটার মুখে লাগিয়ে দিতে হবে। তখন ঘোড়াটা চলতে পারবে ও লাল জাম খেতে পারবে। ঘোড়াটার দশটা লাল জাম খাওয়া হলে তুমি ওটার পিঠে চড়বে। ঘোড়াটা তখন তোমাকে সূর্য্যি পাহাড়ে নিয়ে যাবে। পথে একটা জলন্ত আগুনের পাহাড় পড়বে। দাউ দাউ করে আগুন জলছে সেখানে। সেটা তোমার পার হতে হবে। ঘোড়াটা যখন আগুনের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন তোমাকে দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করতে হবে। একটু উঃ আঃ করেছ কি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তারপর পড়বে একটা বড় সড় সাগর। সব সময়ই ঝড় বইছে সে সাগরে। বরফের মত ঠাণ্ডা ঢেউ আর বাতাস যেন চাবুক মারবে। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করতে হবে। হি হি করে কাঁপতে পারবে না। একটু কাঁপছ কি সাগরে তলিয়ে যাবে একেবারে। সেই ঠাণ্ডা সাগরটা পার হতে পারলেই সূর্য্যি পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। তখন মায়ের কিংখাবটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

লেমি তার দাঁত পরখ করল, জলন্ত আগুন আর বরফ শীতল ঢেউর কথা ভাবল। আতঙ্কে ছাইয়ের মত হয়ে সাদা হয়ে গেল সে।

বুড়ী এই দেখে হেসে উঠল, "বাছা, তুমি সহ্য করতে পারবে না, যেওনা তুমি। তোমাকে ছোট একটা লোহার বাক্স ভরা সোনা দিচ্ছি। বাড়ী যেয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।"

এই বলে বুড়ী পাথুরে বাড়ীটার মধ্য থেকে লোহার একটা ছোট বাক্স ভরা সোনা বার করে দিল। লেমি এটা নিয়ে ফিরে আসে।

ফিরতে ফিরতে লেমি মনে মনে ভাবে, "এই এক বাক্স সোনা দিয়ে আমি বেশ সুখে থাকতে পারব। বাড়ীতে এটা নিয়ে যাব না। চার জনের জন্য খরচ না করে একা আমার জন্য খরচ করা ঢের ভাল।" এই ভেবে সে ঠিক করল যে সে বাড়ী ফিরবে না। লেমি একটা বড় শহরে চলে গেল।

(আগামী সংখ্যায়)

শিক্ষার গল্প

॥ নুরুল ইসলাম খান ॥

গল্প শুনতে কে না ভালবাসে? তিন বছরের খোকা থেকে আরম্ভ করে একশো বছরের বুড়ো দাদু পর্য্যন্ত সবাই গল্প শুনতে ভালবাসে। কিন্তু শিক্ষার গল্প? তা'ও কি কখনো হয়? ছোট ভাইবোনেরা তো নাম শুনেই একদম ঘাবড়ে গ্যাছে, এ আবার কি? শিক্ষা বল্লেই তো বোঝা যায় অংকের ক্লাসের সেই শির-দাঁড়া বার করা শক্ত চোয়ালওয়ালা মজিদ সাহেবের বেত আর ইংরেজী ক্লাসে হর্ষনাথ বাবুর সেই রামদা'র মতো ভয়ানক প্রশ্ন,—বলতো প্রনাউন কয় প্রকার? না পারলেই তো কানমলা আর রামচাটি।

স্কুলের সেই ভয়ানক দিনগুলির কথা কারই বা কম মনে পড়ে? রবি ঠাকুর একে বলেছেন, "আন্দামান"—আর জানই তো আগে বঙ্গোপসাগরের এই আন্দামান দ্বীপে ভয়ানক অপরাধীদেরকে আজীবন নির্বাসন দেওয়া হোতো। তবে তোমাদের আমলে, অন্ততঃ আমার যা ধারণা দেশ বিভাগের পরে আগকারার মতো পীড়ন মাষ্টার সাহেবরা করেন না। তার কারণ হলো, এতদিনকার সমালোচনা তাছাড়া উপর থেকে কিছুটা নির্দেশ।

কয়েকদিন আগে কাগজে পড়লাম, নিউ ইয়র্কে রবার্ট বলে বারো বছরের একটা ছেলে বিজ্ঞানের ওপর অত্যন্ত কঠিন সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে কয়েক লাখ টাকা পুরুস্কার পেয়েছে। এসব ঘটনা ইংলণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে আশ্চর্য্য ঘটনা নয়। আমি যখন আগে পড়তাম, মাইকেল ক্যারেডের স্কুলের পড়া অত্যন্ত অল্প, অথচ তিনি বিরাট বিজ্ঞানী হয়েছিলেন, তখন অবাক লাগতো। কিছুদিন আগে ঢাকার কোন সিনেমা হলে হলিউডের জে আর্থার, র‍্যাঙ্ক প্রযোজিত একখানা ডকুমেণ্টারী ছবি দেখানো হয়েছিলো। ছবিটি আগাগোড়াই শিশুদের নিয়ে। তাতে দেখানো হয়েছে কি করে আমেরিকায় ভূমিষ্ট হবার পর থেকেই প্রতিযোগীতা শেখানো হয়। যে সব শিশুরা হামাগুড়ি দিতে পারে, তাদের দিয়ে হামাগুড়ির দৌড় প্রতি-যোগীতা করানো হচ্ছে। চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা যাতে শরীর চর্চার দিকে মনোযোগ দেয় সেজন্য তাদের মধ্যে কুস্তি এবং বক্সিং প্রতিযোগীতা করানো হচ্ছে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা, প্রতিযোগীতাবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায়। আমাদের দেশে এই সার্বিক শিক্ষায়, বলা বাহুল্য, মুরুব্বিদের নজরই নেই। এর ফলেই ছেলেরা স্কুল পালায়, ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর ম্যাট্রিক ফেল করে। আর স্কুলের কথা শুনলেই গা দিয়ে ঘাম ঝরে।

তা'হলে আমাদের দেশের শিক্ষার সাথে পশ্চিমা দেশগুলির শিক্ষার তারতম্যটুকু স্পষ্ট হলো অনেকটা। ওরা শিক্ষায় মজা পায়, তাই ছেলেরা শিখে। আর আমাদের দেশের ছেলেরা অনেক কষ্টে-সিষ্টে যে কজন পাশ করে, তার পনর আনাই পরে কেরাণীগিরি লাইন ধরার জন্য দিনরাত ছুটোছুটি করে জুতোর হাফসোল ক্ষয় করে ফেলে। মোট কথায় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে বাস্তবের যোগাযোগ অত্যন্ত অল্প বলেই ছক বাঁধা চাকুরীর বাইরে নতুনতর পথ সন্ধানে ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়াস আমরা পাই না। দু'বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ মির্জা নুরুল হুদা কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবের সাথে যোগাযোগ খুবই অল্প। তাই আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং অধিকাংশ ছেলে গাঁ থেকে আসা সত্বেও, তোমরা কৃষি সম্বন্ধীয় অর্থনীতি বুঝতে অসুবিধা বোধ করো।" আমাদের দেশের পাঠশালার ছেলেমেয়েদের পরী, রাক্ষস আর ভূতের গল্প শেখানো হয়, কিংবা বিদেশের কোন দুঃসাহসী আবিষ্কারক, যোদ্ধা বা এরকম অন্য কিছুর কাহিনী শেখানো হয়, কিন্তু নিজের দেশের পরিশ্রমী কৃষকের বা সমবায় থেকে উন্নতি করেছে এমন লোকের কাহিনী ছেলেমেয়েদের বইতে নেই। অথচ আমাদের দেশের কৃষকদের নিয়ে গল্প লেখার কি কম মাল-মসলা আছে ?

এসব অসুবিধা আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে উচ্চতর শিক্ষায় এসে। এখানে শিক্ষা এতই উচ্চ যে অনুন্নত দেশের অধিবাসী বলে আমরা বাস্তব জ্ঞান দ্বারা এবং কোন নাগালই পাই না। যা, কিছু পড়ানো হয় তার অধিকাংশ হলো বিদেশী সমাজব্যবস্থার কথা। সুতরাং শিক্ষার্থীর কাছে তা অত্যন্ত অচেনা ঠেকে।

সবচেয়ে বড় অসুবিধার কথা হলো ভাষার কথা। আজও শিক্ষার বাহন হলো ইংরেজী ভাষা। নিজেদের পরিণত মাতৃভাষা থাকতে আজো আমাদের বিদেশী ভাষা শিখে, তার মাধ্যমেই নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে হচ্ছে। এ অত্যন্ত বাস্তব অসুবিধা। যেখানে মাতৃভাষা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে রীতিমত সময় পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দরকার হয় সেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী একটা ভাষাকে শিখে, তা আয়ত্ত করতে যথেষ্ট বেগও তো পেতে হবেই। এইজন্য অধিকাংশ ছেলেমেয়ে মুখস্ত করেই বি, এ, এম, এ, পাশ করে। তাই অধীত বিদ্যা বাস্তবক্ষেত্রে এসে তারা বড় একটা কাজে লাগাতে পারে না। সাগরপার থেকে যারা বড়ো বড়ো ডিগ্রী নিয়ে আসেন তাঁরাই হন আমাদের দেশের ব্যবস্থাদির কর্ণধার। কথা বল্লে চোখ কপালে তুলে, তাঁরা বলেন, —"ও মাইগড্, সেও কি সম্ভব ? বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচার অসম্ভব। তার ব্যবহারিক শব্দ ভাণ্ডার নেই।" আসলে ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করেন বলে, তাঁরা দেখতে পান না যে, ইংরেজরা মাতৃভাষার সাহায্যেই নিজেদের দেশে শিক্ষা বিস্তার করছে। জার্মাণী, ফ্রান্স, জাপান, রাঁসা সবাই যার যার নিজের ভাষায় শিক্ষালাভ করছে।

[illegible] এ কথার ঠিক জবাবই দিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "পরিভাষা আগেই সৃষ্টি হয় না, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তা' সৃষ্টি করা হয়।" এই কারণেই বাংলা ভাষায় উচ্চতর শিক্ষার কোন বই নেই। কিনে পড়বে কে? দরকার নেই, লেখবে কেন লেখকেরা? কিন্তু চেষ্টা যদি করা হয়, আমার মনে হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সবকিছু সম্ভব করা যেতে পারে।

তাই আমরা দেখতে পাই, পড়ানোর বিষয় বস্তুতে যেমন বাস্তবনির্ভরতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন, শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাকে করা। ছেলেদের স্কুল জীবনকে আরো বেশী প্রতিযোগীতামূলক ও বহুমুখী করা দরকার। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা বাড়ীঘর ছেড়ে বড় একটা বাইরে যেতে পারে না, এজন্যে তাদের মধ্যে কূপমণ্ডূকতাবোধ অত্যন্ত বেশী করে জন্মায়। প্রত্যেক স্কুল থেকে বিশেষ বিশেষ ছুটিতে বাইরে ভ্রমণের জন্য শিক্ষকদের নেতৃত্বে শিক্ষা মিশন যাওয়া উচিত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, টাউনের স্কুলগুলোতেও এর অত্যন্ত অভাব। কলকারখানা, দর্শনীয় জিনিসপত্র, আধুনিক বিষয়ের প্রতি ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক কৌতূহল আকর্ষণ করা উচিত। কিন্তু অসুবিধা এই যে, টাকা পয়সার অভাবে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের অবহেলায় ও উদ্ভাবনশীলতার অনটন হেতু এ সব ছোটখাট কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কাজে পরিণত করা হয় না। আমাদের বিদ্যা চার দেয়ালের মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যাতে বিদ্যা-লব্ধ বুদ্ধির মুক্তি ঘটেনি — বরং অনুর্বর রয়ে গেছে।





সবুজ সেনা

। মেহেরুণ নেসা ।

বন্ধ্যা রাতের আঁধার ফুরাতে ঝরেছে হাস্‌না-হেনা
উদয় প্রভাতে ও'কারা জেগেছে, সেজেছে জঙ্গী সাজ ?
চির সুষুপ্ত ঘরের আঁধারে ফেলেছে আলোর রাজ,
শূন্য পৃথ্বীর, পূণ্যের দূত — মুক্ত সবুজ সেনা।
হে সবুজ সেনা ! এসো এসো এই বন্ধ্যা মাটির প'রে,
কাস্তে খন্তা, হাতুড়ী কলম, উন্নত হাতিয়ার—
দীপ্ত বুকের তপ্ত আবীর ফসলের সেরা সার—
ঢেলে দিয়ে আজ সাজাই বন্ধু ! এ মাটি নতুন করে।
হে সবুজ সেনা ! এসো এসো আজ গুমোট অন্ধকারে,
মাতা ও ভগ্নী ভাইয়ের যেথায় বেদনায় গুমরায় ;
আহ্‌বান দানো তাদেরও বন্ধু ! এ মাটির অধিকারে—
ফসল ফলাতে, এ মাটি সাজাতে আসুক তারা সভায়।
বন্ধ্যা রাতের আঁধার ফুরাতে হে সবুজ সেনা ভাই !
মুক্ত তোমরা, মুক্তির দূত লাঞ্ছিত-জনতার—
দুয়ারে দুয়ারে হেনে যাও ঘাত হরদম্‌ হামেশাই ;
পাষাণ পুরীরে তুমি মেরে-করো উল্লাসে একাকার।
এসো এসো আজ মুক্তির দূত হে সেনা সবুজ ভাই !
লাঞ্ছিত মূক্‌-জনতার আজ লক্ষ সালাম তাই।



কিস্‌সা-কাহিনী

আধাআধি

॥ আবু জাফর ॥

বাড়ীতে মস্ত বড় পেয়ারা গাছ। সকালে গাছের মাথার দিকে তাকালে দেখা যাবে জামাল চুপি চুপি ডালের পাতা সরিয়ে দিয়ে পাকা পেয়ারা খুঁজছে। নীচের দিকে তাকালে দেখা যাবে হীরা হাঁ করে উপর পানে চেয়ে গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। হীরা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। ওর হাতে সবসময়ে দু'পয়সা দামের একটা বাঁশী থাকে। মা এলেই তাড়াতাড়ি হুইসিল দেয়; অর্থাৎ নামবার ইঙ্গিত করে। জামাল হুইসিল শুনে মুহূর্ত্তের মধ্যে সড়্ সড়্ করে নেমে পিছন দিকের পাঁচিল টপকিয়ে উধাও হয়ে যায়। পাকা পেয়ারার ভাগ সব সময় আধাআধি।

সেদিন দুপুরে মা যোহরের নামাজ পড়ছিলেন। ওরা দুজনে চুপি চুপি পেয়ারা তলায় হাজির হলো।

রোশেনা বারান্দায় বসে কি যেন সেলাই করছিলো। রোশেনা ওদের বড় বোন। জামাল ভালকরে একবার এদিক ওদিক তাকাল। দেখলো শুধু টগা কুকুরটা ছাড়া আর কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। হীরা আশ্বাস দিয়ে বললো, ওঠ ওঠ মা নামাজ পড়ছেন আমি এখুনি দেখে এলাম'। জামাল উঠে পড়লো। পাতার খস খসানি শব্দটা একটু বেশী হওয়াতে রোশেনা হাতের কাজ ফেলে একবার কান খাড়া করলো। তারপর চেঁচিয়ে উঠল "হনুমান এসেছে মা পাকা পেয়ারাগুলা বোধ হয় সব নিলো।" মায়ের নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি হনুমান তাড়ানো লগি খানা নিয়ে পেয়ারা তলার দিকে এগিয়ে গেলেন। হীরা কিন্তু আগেই টের পেয়েছিলো; সেদিন হাতে বাঁশী ছিলো না। তাই জামালকে সঙ্কেত ধ্বনি দিতে পারেনি। সে আগেই পালিয়েছে শাস্তি পাওয়ার

ভয়ে। মা পেয়ারা তলায় এসে গাছের উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন গাছে বাগানের হনুমান নয়—বাড়ীর হনুমানটা ফাঁকি দিয়ে পালাবার ফিকির আঁটছে। মা চেঁচিয়ে উঠলেন "না পেয়ারাগুলা ঐ বাঁদরই খেল। ভেবেছিলাম বাড়ী ছেলেটা এলে এক আধটা খাওয়াব কিন্তু হলোনা। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি" বলে সজোরে লগির এক বাড়ি দিলেন জামালের পায়ের গেঁটের উপর। জামাল গাছের উপর থেকে নিস্ফল আক্রোশে কিছুক্ষণ চেঁচালো।

সেদিন বিকেল বেলা সারা আকাশ খানায় হঠাৎ কালি ছড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামলো।

ঢালু পথের গা বেয়ে জল বয়ে যেতে লাগলো হু-হু করে। মাঠের জমি গুলা দূর থেকে রূপোর থালার মত ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো।

পাড়ার ছেলেগুলো এতক্ষণ রোদ বৃষ্টির মধ্যে থেকে খেঁকশিয়ালের বিয়ের কাজ সেরে তেমাথার পথে যেখানটায় হু হু করে জল বয়ে যাচ্ছে সেখানে গোল হয়ে বসেছে। খালি খালি বসা নয়। তারা ওখানে আড়া পেতেছে। মাছ ধরছে। ওখানকার সর্দার হচ্ছে জামাল। ভিজে গায়ে ব্যস্ত হয়ে সে মাছ ধরছে। হীরা ওকে সাহায্য করছে। আর সবাই দেখছে হাঁ করে। জামাল-হীরার চোখগুলো পানিতে ভিজে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। মুখের উপর শেওলা পড়েছে। আজ যেন তাদের আনন্দ আর ধরে না।

ওরা মাছ ধরা ছেড়ে যখন বাড়ী ঢুকলো তখন প্রায় সন্ধ্যে। বাড়ী ঢোকার আগে জামাল হীরাকে পাঠালো মা কি করছেন দেখবার জন্যে। হীরা সদর দরজার সামনে পাঁচিলটার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো মা কোথায় আছেন। মা তখন রান্না ঘরে বসে রাত্রের ভাত রাঁধছিলেন। হীরা ফিস্ ফিস্ করে বললো "এসো জামাল ভাই। যেই ওরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওমনি মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে একটা মোটা কঞ্চি নিয়ে। মাকে দেখে ওরা ছুট দিতে যাবে এমন সময় রোশেনা জামালের হাত চেপে ধরলো। ওমনি সঙ্গে সঙ্গে মা ও গিয়ে ধরলেন হীরাকে। শপাং শপাং করে বসিয়ে দিলেন ঘা কয়েক ওদের পিঠে। তারপর চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "আমার হাড় মাংস পুড়িয়ে খেলে এই শয়তানের পালরা। দু' দণ্ড যে একটু গা মেলবো তারও জো নেই। রোশেনা বললো, মা তুমি ওদেরকে ভাইজানের কাছে পাঠিয়ে দাও, সেই ভালো হবে। এখানে পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশে মিশে একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে। দেখ না জামালের উন্নতি। বছরে বছরে ঠেলা প্রমোশন।"

ক'দিন পরের কথা। সবে মাত্র ভোর হয়েছে। ওর মা বারান্দায় বসে সুর করে কোরান পড়ছেন। ওরা দু'জনে আঙিনায় পাশাপাশি দুটো মোড়ার উপর বসে রয়েছে। জামালের পায়ের নীচে ওর পোষা টগা কুকুরটা। হীরার কোলে ওর পোষা টুনি বিড়ালটা। রাত্রে একটা পাকা পেয়ারা নিয়ে ওদের ভারী গণ্ডগোল হয়ে গেছে। হীরা পাকা দিকটা

...ছিলো। জামাল কিন্তু চালাকী করে পাকা দিকটা তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে কেটে ওকে কাঁচা দিকটা দিয়েছিলো। এই হল আড়ির মূল কথা। হীরা ঘোড়ার উপর বসে বসে খাঁড় চিবাচ্ছে। জামালের মুড়ি আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। টগা কুকুরটা হাঁ করে হীরার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জামাল আদর করে ওর কুকুরটার মাথায় হাত বুলাচ্ছে হীরা মুড়ি খাচ্ছে আর বলছে, একজনের কুকুর আমার মুখের পানে তাকাচ্ছে ছোঁচার মত।

জামাল কথাটা শুনেই কুকুরটার মাথায় এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিলো। কুকুরটা কাঁউ কাঁউ করে উঠলো। হীরার কোলের টুনি বিড়ালটি পিট পিট করে তাকালো একবার টগার পানে। জামাল সেটা লক্ষ্য করে অমনি বলে উঠল, একজনের বিড়াল আমার কুকুরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হীরা হেঁট হয়ে দেখল সত্যি টুনিই বিড়ালটা টগা কুকুরটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হীরা হেঁসে বিড়ালটার কান ধরে টান দিলো। বিড়ালটা অমনি মিউ মিউ করে চেঁচিয়ে উঠো এবং সঙ্গে সঙ্গে হীরার হাতের উপর নখ দিয়ে আঘাত করে এক লাফে কোল ছেড়েচলে গেল। জামাল খিল খিল করে হেসে উঠলো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর মা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এমন একটা মোক্ষম সুযোগ জামাল ছাড়তে রাজী নয়। চট্ করে দা'খানা নিয়ে হীরাকে চুপি চুপি বললো, আমার সাথে আয়। ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো। হীরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দা কি করবে ভাই?' জামাল খুব ব্যস্ত হয়ে ছোট্ট করে শুধু বললো, 'দেখ্ তো কি করি।' বাড়ীর সামনেকার বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে হীরাকে বললো, দা' টা ধর্। আমি বাঁশে উঠার পর চাইলে দিবি। হীরা ঘাড় নাড়লো বটে কিন্তু ওর মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। হীরা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই বাঁশে উঠে কি হবে, বল না!' জামাল ঠোঁটের মাঝখানে একটা আঙ্গুল রেখে একটা শিষ দিয়ে নীচু গলায় বললো, চুপ, ছিপ বানাবো। সের পুকুরে মাছ ধরতে হবে। হীরা যেন হঠাৎ হাতে স্বর্গ পেলো। কারণ সে পুকুরে পাড়ার অনেকে মাছ ধরে। হীরা শুধু হাঁ করে ওদেরদিকে তাকিয়ে থাকে। আজ সে সুযোগ নিজের হাতে মধ্যে পেয়ে হীরা আনন্দের আতিশয্যে বাঁশতলায় নাচের ভঙ্গীতে পোঁ পোঁ ঘুরলো দু-তিনবার। ওদিকে জামাল একরাশ কঞ্চি কেটে ছিপ্ তৈরী করতে লেগে গেলো।

সন্ধ্যা হবো হবো। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। এখুনি বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। জামাল-হীরা তখনও সের পুকুরের ধারে বসে বসে কানা বকের মত মাছ ধরছে। একটু আগে জামালের ছিপে একটা খুব বড় মাছের মত কি যেন ফস্কে পালিয়ে গেছে। সেটা মাছই হবে বোধ হয়। জামাল ভাল করে বসলো এবার। আর যেন ফস্কে না পালায় মাছটা।

হীরা বললো, চলো ভাই বাড়ী যাই। বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার শীত করছে। জামালের দৃষ্টিটা সব সময় ফতনার দিকে। কি জানি এবারেও মাছটা ফাঁকি দিয়ে পালায়। তাই ও ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, পানিতে ভিজতে পারবি না, তবে মাছ ধরতে এসেছিস কেন? হীরা আর কোন কথা বলতে সাহস করলো না।

চারিদিকের মাঠ ঘাট কালো করে ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। সুয্যিটা কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে এইমাত্র চুপি চুপি বিদায় নিয়েছে। সামনের আম গাছটার শাখায় বসে দু'টো ভিজে কাক ডানা ঝাড়ছে পত্পত্ করে। হীরা বসে বসে একমনে তাই দেখছিলো।

এমন সময় জামাল শাঁ করে ছিপটাকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে বললে, না ও আজ আর আসবে না। কাল ওকে দেখা যাবে। চল বাড়ী যাই।

চুপি চুপি ওরা যখন বাড়ীর সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন বেশ কিছুটা রাত হয়েছে। ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে ওরা চমকে উঠল। দেখলো মা বারান্দায় বসে বসে নামাজ পড়া শেষে তছবীহ পাঠ করছেন। আর তাঁর ডানপাশে হাতের কাছে মোটা লম্বা ছড়িখানা দেখেই ওরা বুঝলো কাদের জন্য ওটা রাখা হয়েছে। জামাল হীরাকে চুপি চুপি বললো, 'চল ঐ দরজা দিয়ে যেয়ে পেয়ারা তলায় বসি গে' তাই হলো। ওরা দু'জনে পেয়ারা গাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়ে বসলো। জায়নামাজ উঠিয়ে রাখতে রাখতে মা বললেন, রোশেনা তুই সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিস তো। রোশেনা হঠাৎ চমকে উঠে বললো হ্যাঁ মা সব জায়গা দেখেছি।

ওরা দুজন চুপচাপ বসে আছে। কিছুক্ষণ পর রোশেনা হারিকেন হাতে আবার বেরিয়ে পড়লো ওদের খুঁজতে। পেয়ারা গাছের পাশ দিয়ে যেতে হঠাৎ ওর চোখ পড়ল গাছটার গোড়ার দিকে। কাছে গিয়ে দেখলো ঠিক ওরাই বটে। জামালের গায়ে হাত পড়তেই রোশেনা চমকে উঠলো। ওঃ কি গরম ওর গাটা! মা ছুটে এলেন। রোশেনা বললো জামালের গায়ে ভীষণ জ্বর। মা একবার হাত দিয়ে দেখলেন তারপর ওদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। জামাল-হীরা তাকালো। দৌড়ে পালাবার চেষ্টাও করলো একবার। রোশেনা ঐ অবসরে ওদের পুঁটি মাছটা মাটি থেকে হাতে তুলে নিয়ে বললো, দেখ মা; সারাদিন টো টো করে বেড়িয়ে কত বড় এক কাতলা এনেছে দেখ। মা মাছটির দিকে তাকিয়ে বললেন; ওটা ওদের ভেজে দে। জামাল ছোঁ মেরে রোশেনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো, আমি নিজে ভাজবো। বুবু ভাজতে যেয়ে খেয়ে ফেলবে। সুযোগ বুঝে হীরা চুপি চুপি বললো, ভাই, মাছের ভাগ আধাআধি কিন্তু!

ভূগোলিষ্ট

হাবীবুর রহমান মল্লিক

—০: :০—

পর পর দুটো টারমিনাল পরীক্ষাতেই রবুদা যখন ভুগোলে শুধু জিরো পেলো এবং ওর প্রতি মাষ্টার সাহেবের সুমধুর বাক্য (গালি) বর্ষিত হোতে লাগলো, তখন রবুদা পণ কোরে প্রতিজ্ঞা বসলো যে সে ভুগোলে এক্সপার্ট হবেই। বাসায় এসেই প্রতিজ্ঞা মাফিক ভুগোল পড়তে শুরু করলো। অর্থাৎ যাকে আরো ভেঙ্গে চুরে বলতে পার ভুগোলের সাধনা। রবুদার সে প্রতিজ্ঞার কথা যদি কোন ঐতিহাসিক শুনতো তা'হলে মহাভারতের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতো ওর এ প্রতিজ্ঞার কথাও জাতীয় ইতিহাসে "রবুদার প্রতিজ্ঞা" স্বর্ণাক্ষরে ছাপা হোয়ে অবিস্মরণীয় হোয়ে থাকতো। কিন্তু হতভাগা "রবুদার কথায়" জাতীয় ঐতিহাসিকরা ওর মতো, ডায়মণ্ডের কদর বুঝতে চাইবে না।

যাই হোক এখন দিন রাত শুধু ভুগোল আর ভুগোল পড়ে। ও পাকা ভুগোলিষ্ট হবে।

রাতের বেলা। লাইট জ্বালিয়ে পড়তে পড়তে রবুদা ভাবে: ইস্ এমন পড়া পড়ব যাতে পরীক্ষাতে মাষ্টার ব্যাটারা একশোতে একশো পাঁচ দিতে বাধ্য হয়। এমন লেখা লিখবো যে সে লেখার তোড়ে সব মাষ্টার ব্যাটা ভেসে যাবে। হুঁ হু বাবা এমনি আমার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। তারপর আবার সবেগে মাথা নেড়ে "এ্যা এ্যা কোরে" চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলো। সেকি পড়া! পড়া নয়তো যেনো কোনো দরবারী ওস্তাদ সুর ধরেছে দরবারে বসে। ওর সুশ্রাব্য সুরে (কর্কশস্বরে) এঁ্যা এ্যাঁ পড়া শুনে ঘরের এক কোন থেকে অন্য কোনে উড়ে গেলো কয়েকটা আরশোলা। বোধ হয় রবুদার এহেন প্রাণঢালা পড়া শুনে। আরশোলাগুলো র'সিক আছে বলতে হয়। যা হোক রবুদা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে টারমিনাল পরীক্ষার কথা মনে পড়ে যায়। আর অমনি মনে মনে ফোঁস কোরে ওঠে: হুঁ ব্যাটা ভুগোল স্যার কিনা আমায় গোল্লা মানে জিরো দিয়েছে। স্পর্দ্ধা দেখো। যদি মাথায় একছটাক বুদ্ধি থাকতো। ব্যাটা স্যারের জানা উচিৎ ছিলো যে ভাবীকালে আগত এ্যানুয়েল পরীক্ষায় একশোতে একশো পাঁচ পাবো।

ভাবাকাল এবং আগত—কথা দুটো ওর কাছে খু—উ—ব ভাল লেগেছে। ভাবীকাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এবং আগত অর্থাৎ যা আসছে। বাঃ কেমন সুন্দর অর্থ কথা দুটোর। কথা দুটো রবুদা ইয়া মোটা বাংলা অভিধান খুঁজে শব্দার্থ বুঝে বের করেছে। তাছাড়া আমাদের রবুদা লেখক গোছের কিনা তাই ওধরণের কঠিন অথচ সুন্দর কথা ভালোবাসে। পণ্ডিতীভাষায় যাকে অলঙ্কারযুক্ত 'শব্দ বলতে পারো। ঢং ঢং কোরে রাত বারোটা বাজে। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে রবুদা উঠে গিয়ে এককোণায় রক্ষিত কলসী থেকে খানিকটা জল নিয়ে চোখ ধুয়ে আবার পড়তে বসে। "এ্যাঁ পৃথিবী ঠিক কমলালেবুর মতো। এ্যাঁ পৃথিবী গোল এ্যাঁ তাহার তিনটি প্রমাণ আছে।" পৃথিবী যে গোল তা রবুদা অতি সহজ উপায়ে বার্ষিক পরীক্ষায় লিখবে স্থির করে। "ওহ, তাহোলে সারা ক্লাসের ছাত্রদের ভেতর একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে তাতে সন্দেহ নেই।" মনে মনে রবুদা অত্যন্ত উৎফুল্ল হোয়ে ওঠে। সাড়ে বারোটা বাজতেই রবুদার চোখ দুটোতে নেমে আসে সারা রাজ্যের ঘুম। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে দেহটা এলিয়ে দেয় বিছানার ওপর। আর সাথে সাথে গভীর ঘুমে অচেতন।

জানালা দিয়ে ভোরের সূর্য কিরণ মুখের ওপর পড়তেই রবুদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে বেশ বেলা হোয়ে গেছে। শীতের সকাল। তায় আবার রাত জেগে পড়ার দরুন আজ উঠেছে অনেক বেলায়। সাত তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্রাতঃরাশটা সেরে নেয়। তারপর ভূগোল বইটা নিয়ে পড়তে বসে রবুদা। ঘণ্টা খানেক অবধি পড়ে স্নান সেরে খেয়ে ছোটে স্কুলের দিকে।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনটি এসে যায়। রবুদা তো আহ্লাদে চোদ্দখানা। ভূগোলে আর জিরো পাবে না। যা লিখবে—তা অভিনব যুগান্তরকারী লেখা। ভূগোল পরীক্ষার দিন রবুদা গ্রেট খুশী অর্থাৎ যাকে কাব্যিক ভাষায় বলা যেতে পারে খুশীর সায়রে ভাসমান। ঢং ঢং কোরে পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ে যায়। রবুদা প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে দেখে আর খাতায় কলম চালাতে থাকে খস্ খস্ কোরে। সে খস্ খস্ আওয়াজে অন্য ছাত্ররা আকৃষ্ট হোয়ে তাকায় ওর পানে। অর্থাৎ যাকে বলে 'বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে।' সাড়ে চোদ্দ খানা খাতা শেষ কোরে সগর্বে বুকটা সোয়া দশ ইঞ্চি ফুলিয়ে নির্দ্ধারিত ঘণ্টার অনেক পূর্বেই রবুদা বেরিয়ে যায় হলঘর থেকে। সাড়ে চোদ্দখানা খাতা লিখতে হাফ ডজন কুইক লাগে এবং গোটাচারেক নিব নষ্ট হয়। রবুদা অবিশ্যি এসব পূর্বাহ্নে বাসা থেকে যোগাড় কোরে এনেছিলো। পথে যেতে রবুদা আজকে আনন্দের আতিশয্যে সাড়ে দশটা পয়সা ফকিরকে দান কোরে ফেলে।

পরীক্ষা শেষ হোয়ে যায়। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে বার্ষিক পরীক্ষার ফলও বেরোয়। প্রগ্রেস রিপোর্টটা পেয়ে রবুদা একেবারে স্তব্ধ হোয়ে যায়। তারপর সাঝের শীতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চলে আসে বাড়ীতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! রবুদাকে সপ্তাখানেক ধরে ওর বন্ধু গোলু, মোনু, মোলু, কেউ দেখা পায়নি। কি দুঃখে কোথায় ডুব দিয়েছে তা ওরা কেউ বুঝতে পারলো না।

হাঁ একমাত্র আমিই জানি এ রহস্যের আসল ব্যাপার। চুপি চুপি বলছি শোনো। ভুগোলিষ্ট রবুদা ভুগোল পরীক্ষায় লিখেছিলো : আমার মতে পৃথিবী ডিম্বাকৃতি। তাহার যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। প্রয়োজন মত সবই বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু ইহার পুর্বে আরও কিছু বলিবার আছে। পৃথিবী মহাশূন্যে আপন কক্ষপথে ঘুরিতেছে না। এবং মাধ্যাকর্ষণ বলেও কিছু নাই। ইহা সমস্তই ঝুটা। আসল কথা হইতেছে যে এ সমস্তই পরম দয়ালু খোদাবন্দ তালার লীলা খেলা। তাঁহারই অলঙ্ঘনীয় আদেশে পৃথিবী চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে। ইহাই হইল পৃথিবী যে কি অবস্থায় আছে তাহার সঠিক বিবরণ। পুস্তকের বর্ণনা মাফিক দিলাম না। কারণ ঐ সমস্ত ঝুটা বাত লিখিলে খোদার গজবে পড়িব বলিয়া।
পৃথিবী যে, গোল তাহার কয়েকটি প্রমাণ পুস্তক বহির্ভূত নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিলাম।

(ক) খুব ভোরবেলা সাইকেল চড়িয়া রমনা মাঠের চতুর্দিকের রাস্তায় চালাইয়া দেখিয়াছি যে, একই স্থানে আসিয়া পৌঁছি। ইহাতে প্রমাণ হয় যে পৃথিবী গোল।

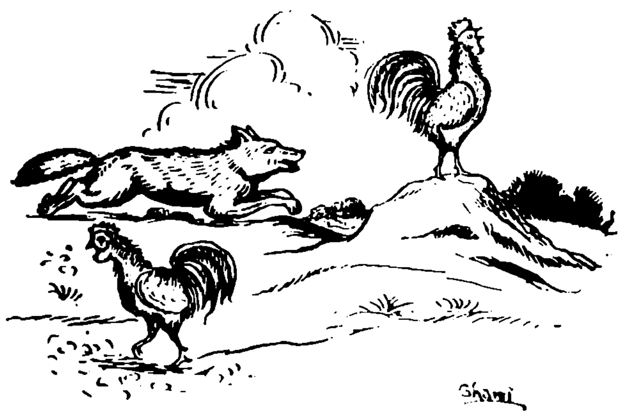
(খ) খুব উঁচু দালানের নীচে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিলে দেখা যায় সমগ্র দালানটা ঘুরিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে পৃথিবী গোল।

(গ) সকাল বেলা খাওয়া-দাওয়া করিয়া প্রত্যহ যখন বাসে চড়িয়া স্কুলে যাই। লক্ষ্য করিয়া দেখি প্রত্যহ ঘুরিয়া বাড়ীতেই আসি। পৃথিবী গোল না হইলে সোজা একদিকে চলিয়া যাইতাম।

টিকা :—উপরে যাহা লিখিলাম সে সমস্তই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণিত। সুতরাং আশা করি একশোতে একশো পাঁচ পাইবই। ইত্যাদি ইত্যাদি। রবুদার সাড়ে চোদ্দখানা" খাতা এমনি সব দামী থিউরীতে পুর্ণ। তোমরাই বলো এধরণের লেখা পড়ে কোন্ মাষ্টার না খুশী (রেগে) হোয়ে একশো পাঁচ (জিরো) দেবেন। তাই আমাদের রবুদাকেও মাষ্টার সাব একশো পাঁচ (জিরো) তো দিয়েছেনই, উপরন্তু ওর বাবাকে ডেকে ওকে অন্য স্কুলে

ভর্ত্তি কোরে দিতে বলেছেন। রবুদার বাবাও সেইদিনই চাটগাঁ থেকে এসেছেন ব্যবসায় মোটা লাভবান হোয়ে। মনটা তাই উৎফুল্ল। আর রবুদা পাশ (ফেল) হোয়েছে দেখে বাবার সুমধুর আপ্যায়নের (মারের ভয়ে) জন্যে কোথাও যাবার জন্যে ছটফট কোরছিল। ঠিক সেই সময় ওর মামাও কোলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো। সপ্তাখানেক পরই রবুদা ওর মামার সাথে কোলকাতা অন্তর্হিত হোল। স্থির কোরলো দিন পনেরো ঘুরে ফিরে এবং বাবার রাগ পড়ে এলে বাড়ী ফিরবে। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার।

বর্ত্তমানে ওর বাবা গুণধর সুযোগ্য পুত্রের (আমাদের হাটখোলার ফেমাস হিরো রবুদা) উদ্দেশ্যে বিশেষ সুশ্রাব্য ভাষা (গালাগাল) প্রয়োগ কোরলেন না। কারণ মন তাঁর ব্যবসায় লাভবানে আনন্দে মশগুল। তাই তিনি রবুদা ফিরে এলে অন্য স্কুলে ভর্ত্তি কোরে দেবেন স্থির কোরেছেন। অবিশ্যি তিনি যদি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হতেন তাহোলে রবুদা আসামীর কি কোরতেন তা তোমরা সহজেই অনুধাবন কোরতে পারো।



আসলো কই ?

॥ রফিকুল হক ॥

—০: :০—

ইশ্‌টিনশা, ইশ্‌টিশান,
লোক গম্‌গম্ যাত্রীদল—
আসবে কখন গাড়ীখান
বল্ বল্ ভাই জলদি বল্।

আস্‌লোরে, আস্‌লোরে,
ঐ তো গাড়ী আসতেছে—
খোকা এবার হাস্‌লোরে
দাদা মশায় আস্‌চে যে।

সর্ সর্ সর্ রেলগাড়ী
ইশ্‌টিশানে থাম্‌লো ঐ—
আয় ভাই আয় খোঁজ করি
খোকার দাদু আস্‌লো কই ?

ইশ্‌টিশান, ইশ্‌টিশান,
রেলগাড়ী ঐ ছাড়লো রে—
ভরভরাট ব্যথায় মন
খোকন বাড়ীর পথ ধরে।

—·—

গাঁয়ের পথে

আখতারুন্নেসা

বহুদিন পরে ফিরছি গাঁয়ের পথে। অনেক খানি আনন্দ তাই রয়েছে বুক জুড়ে। বারে বারে মনের কোনে ভীড়, জমায় ছেলেবেলার দিনগুলি। নীরু, মিনু, নাজু, চিনু আজ কেমন আছে কে জানে? ... ... পদ্মদিঘী, লিচুতলা, গোলাপ জামের গাছটি ... ... আমগাছের ডালে ঝুলানো দোলনে। ... ... একে একে দুষ্টুমী ভরা দিনগুলো উঁকি দিলত্ত মনের কোণে। .. ... পুরানো স্মৃতির ভারে বুঝিবা আনমনাই হয়ে গেলাম কিছুটা ... ... !

... ... আরে? ছোট মামা যে? ট্রেন থামতে না থামতেই তড়াক করে নীচে নেমে গেলাম। হৈ হল্লা হুআর গল্প গুজবে কখন যে পথ শেষ হয়ে গেল টেরই পাওয়া ভার।

... ... পরদিন ভোর হতেই ঘুম টুটে গেল সাথীদের ডাকাডাকিতে! বিরক্তিভরা চোখ মেলে চাইতেই বিস্ময়ে আর আনন্দে মুখখানা ভরে গেল। —"বাঃ তোরা? কেমন আছিস?"

—"ভালোই—তুই?" —নীরুই সবার আগে মুখ খোলে?

—"চল্‌না, পদ্মদিঘীতে ফুল ফুটেছে অনেক। মিনু এগিয়ে আসে সুমুখে।

—"চল্ রিনু, ভোর হয়ে এল যে—!" নাজু তাড়া দেয়।

—বাঃ এখনও শুয়েই থাকবি বুঝি।" চিনু সবশেষে বলে।

—"উঃ এখনও তোরা একেবারে আগের মতোই রয়েছিস? চল যাই।" হাসি মুখে আড় মোড়া ভেঙ্গে এক লাফে উঠে পড়লাম। কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি পা বাড়ালাম পদ্মদিঘীর পথে।

... ... গাছ পালায় ঢাকা মেঠো পথ বেয়ে হাঁটা শুরু করলাম পাঁচ বন্ধুতে। ... ... আবছা আঁধার তখনও জড়িয়ে রয়েছে সারা ধরনীর বুকে। রাতের শেষে আলো আঁধারের মাঝে মেঠো পথ বেয়ে এগিয়ে যেতে কেমন যেন এক মিষ্টি আমেজে ভরে গেল সমস্ত মনটা।

…… পদ্মদিঘীর পানে এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ালাম। উঃ কত্‌তো ফুল। ইস্‌ যদি পেতাম একটা। …… এদিকে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ে নীরুরা। …… বোকার মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে। অনেক দিন বাদে দাঁড়ালাম পুকুর পাড়ে। …… আর সাঁতার? সে তো জানতাম না কোনদিন।

—"বা রে! দাঁড়িয়ে রইবি বুঝি! আয়না!" খিল খিল করে হাসতে শুরু করে নাজুরা।

—"যাচ্ছি রে!" —মুখে বল্লাম "যাচ্ছি' কিন্তু সিড়ি বেয়ে নীচে নেমেই ব্যাপার দেখলাম বেগতিক! … যেই না ডুবিয়েছি এক পা …… অমনি ওমা! একি? নীচের দিকেই নেমে গেলাম যে? …… মাথার মধ্যে কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করতে রইলো। … চোখ দুটোও বন্ধ হয়ে গেল যে? আঁধার হয়ে এলো চারধার। … ভু—উ—স্‌ করে তলিয়ে গেলাম নীচে। অনেক নীচে। … …

…… ঘট্‌ ঘট্‌ ঘটাং। … হঠাৎ প্রবল এক ঝাঁকানী দিয়ে ট্রেন খানি থেমে গেল সশব্দে পলাশ ডাঙ্গায় এসে গেছে। দু'হাতে চোখ দুটি রগড়ে নিলাম একবার। … উঃ এখন ও তবে বেঁচে রয়েছি? … আর—আর… এতক্ষণ যা দেখেছিলাম তো বুঝি সবই স্বপ্ন? …

ঐ যে ছোট মামা এগিয়ে আস্‌ছেন। সবাই মিলে এবারে সত্যি সত্যিই পা বাড়ালাম গাঁয়ের পথে।

… আম, জাম, আর নারাকল বিথীর মাঝ দিয়ে পশ্চিমাকাশে উঁকি দিল ক্ষীণ এক ফালী রূপালী চাঁদ। সে যেন হেসে হেসে স্বাগতঃ জানাচ্ছে আমাদের!



সবুজ সেনার গান

জালাল উদ্দীন জাহাঙ্গীর

আমরা সবুজ সেনা ভাই,
প্রাণের সবুজ রঙে মোরা
সবুজ পতাকা উড়াই।
নয়া জামানার গান গেয়ে গেয়ে,
নয়া স্বপনের পথ বেয়ে বেয়ে
ফুলের মতন হাসি মাখা মুখে
মিলনের গান গাই।
নয়া জামানার দিশারী হাঁকিছে
নতুনের অভিযানে।
সত্য ন্যায়ের মশাল হাতে
দীপ্ত বিজয় গানে।
দানবের হানা সহিব না আর
দৃপ্ত শপথ এই সবাকার
জঙ্গী সবুজ শান্তির দূত
জেহাদে জীবন কাটাই।

●

টাকা

॥ গোলাম মোহাম্মাদ মাস্তান ॥

জগতে টাকার খেলা, মিছে কথা নয়;
টাকা বিনে এ জগতে কিছু নাহি হয়!
বাঁচলেও টাকা লাগে—মরলেও টাকা,
টাকা বিনে এ জগতে অযথাই থাকা।
অনেকেই মুখে বলে টাকা অতি তুচ্ছ;
কিন্তু অসময়ে ভাই ধরে তারি পুচ্ছ।

হারানো সুর

নীলুফার জাহান (মীরা)

কু-হু-উ, কু-হু, উ......

এক সুরে ডেকে চলে নান্টুর কোকিলটা। ভোরে ওর ডাক না শুনে বিছানা ছাড়ে না নান্টু। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে পাখীটাকে; আদর করে ডাকে "কলি", সবাই হেসে বাঁচে না এই উদ্ভট নাম শুনে। পাখীর নাম আবার 'কলি' হয় নাকি? নান্টুর কাছে পৃথিবীর সব কিছুই তো সৌন্দর্য্যের সাথে সংগতি রেখে চলে সুতরাং ওর কোকিলের এ নামটা কোনমতেই বেমানান হতে পারে না। কলিকে কেন্দ্র করে নান্টুর কবিতা লেখাও চলে পুরোদমে। ক-ত যে কবিতা লিখে রেখেছে এখানে সেখানে তার ইয়ত্তা নেই, না আছে কবিতার মিল না আছে ছন্দ, তবু কবিতা লেখা ওর চাই-ই। সেদিন খাঁচার ভেতর কোকিলটাকে ঘুরতে দেখে নান্টু তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখে ফেললো :—

কোকিল, কোকিল, কলি
কি কথা তোমায় বলি,
ঘুরছো কেন হায়,
মন তোমার কি চায়?

কবিতাটি লিখেই পড়ে শোনালো কলিকে। ও ঠিক বুঝলো কিনা সে সব ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই নান্টুর। "কলি" বলে ডাকলেই যখন কু-হু-উ করে ওঠে তখন কবিতা যে বোঝে না তার-ই বা প্রমাণ কি?

বেশ কিছুদিন পরের কথা। খালাম্মার সাথে নান্টুর খালাতো ভাই মন্টু বেড়াতে আসতেই ওর হাত ধরে টেনে আনে নান্টু—

—দেখবি আয় মন্টু, আমার কলি।

—"কলি? সে আবার কি?"—অবাক হয় মন্টু।

—"আমার কোকিল।"

—"কোকিল? কই দেখি।"

—"হ্যাঁ, এই যে ছাখ।"

ওদের দেখেই কলি ডেকে ওঠে, "কু-হু, কু-হু।"

—"বাঃ ভারী সুন্দর তো!

—"বলিনি আমি?"—কলির গর্ব্বে গর্বিত হয়ে ওঠে নান্টু।

—"কোথায় কলিরে কিনেছিস্?

—"না, আমাদের বাগানে, বাসা থেকে পড়ে গিয়ে কুঁই কুঁই করছিল, তুলে নিয়ে এসেছিলাম, প্রায় তিন মাস আগে, এখন বেশ বড় হয়েছে, ডাকতেও শিখেছে।

—"ইস্, আমি যদি পেতাম! লুব্ধ দৃষ্টিতে পাখীটার দিকে তাকায় মন্টু। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে নান্টু ঐ দৃষ্টি দেখে, তাড়াহুড়া করে ওর হাত ধরে বলে—

—চল মন্টু, এখান থেকে যাই।

ওর কথায় কান না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করে মন্টু—

—"এটা আমার কাছে বেচবি নান্টু?

খানিক আগের সন্দেহকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে দেখে ধ্বক করে ওঠে নান্টুর হৃৎপিণ্ডটা—।

মন্টুর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে টেনে নিয়ে আসে নান্টু। কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে যেতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে নান্টু। উঃ কি কুক্ষনেই না মন্টু দেখিয়েছিল 'কলি'কে। খাঁচা থেকে ওকে বের করে আদরে আদরে অস্থির কোরে তোলে নান্টু—। মাত্র আট দিন পর। হঠাৎ একদিন মন্টু ও আরেকটি ছেলেকে আসতে দেখে উৎকনঠিত হয়ে ওঠে নান্টু—।

—'ব্যাপার কি মন্টু? হঠাৎ এলি যে?

—এলাম এমনি বেড়াতে। তারপর তোর কলি ভালো আছে তো? —মিট মিটি করে ওকে হাসতে দেখে আরও জ্বলে ওঠে নান্টু।

হ্যাঁ ভালো আছে বৈ কি? এ ছেলেটি কে?

—ও হোঃ তোর সাথে পরিচয়ই করিয়ে দিইনি, আমার 'ক্লাশ ফ্রেণ্ড' নতুন ভর্ত্তি হয়েছে।

—ও তাই নাকি? শুষ্ক হাসির সাথে জবাব দেয় নান্টু।

মন্টুদের এই অপমানের কোন অর্থই খুঁজে পায় না নান্টু। ... ইচ্ছে করেই সেদিন খালার বাড়ী থেকে যায় মন্টু। আশঙ্কাটা আরও বেশী করে দানা বেঁধে উঠে নান্টুর মনে। ছোট্ট একটা তালা খাঁচার দরজায় লটকিয়ে চাবিটা বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে এক ঝলক রোদ গায়ে পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে নান্টু রোজকার অভ্যেস মত কৈ আজকে তো ডাকছে না কলি? ছ্যাৎ করে ওঠে ওর মন। তবে কি? .... এক দৌড়ে চলে আসে দেউড়ির নীচে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। কলি সহ খাচা উধাও। এক মুহূর্ত্তে সব বুঝতে পারে নান্টু। চীৎকার করে

—"মা, আমার কলি? কলি কোথায়?

চীৎকার শুনে ছুটে সবাই। নান্টুর আপা লিলিও।

—ওমা সত্যিই তো পাখীটা গেলো কোথায়?

—হ্যাঁ! মন্টু নিয়েছে—। কাঁদতে কাঁদতে বলে নান্টু,—সেদিন কিনতে চেয়েছিল দিইনি বলে দু'জনে এসেছিল চুরি করতে।

—আমি আগেই আঁচ করেছিলাম মন্টুকে খাঁচার কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখে—। বললো ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা লিলি।

—থাম্ তোরা। —ধমক দেয় মেজ ভাই—; এই নান্টু কাঁদিস নে। মন্টু কোথায় মা?

—এই একটু আগেই তো ওরা চলে গেলো। মা জবাব দেন।

—এ্যা চলে গ্যাছে? তবে ঠিক ওদের কাজ। নান্টু তুই যা, কলিকে নিয়ে আয়।

দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে পড়ে নান্টু। তখন সবে মাত্র সকাল হয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচল বেশী শুরু হয় নাই। এক রকম ছুটতে ছুটতেই খালার বাড়ী উপস্থিত হয় নান্টু। বাইরের ঘরেই পাওয়া গেল মন্টুকে, পড়তে বসেছে। নান্টুকে হঠাৎ ঢুকতে দেখে বলে

—কি রে নান্টু? এত সকালে কি মনে করে?

বাধা দিয়ে নান্টু বলে, আমি সে কথা শুনতে আসিনি। মন্টু, তুই আমার কলিকে ফিরিয়ে দে।

কলিকে ফিরিয়ে দেব, তার মানে? আমি কি তোর কলিকে নিয়েছি নাকি? আমিতো কিছুই জানিনা।

—জানো না, শয়তান, চোর কোথাকার। বলেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক চড় মারে মন্টুর গালে। ঘুরে টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ে মন্টু।

—আমার কলিকে চুরি করার প্রতিশোধ। বলেই আবার রাস্তায় নেমে পড়ে নান্টু।

সেদিন সামনে রেখে বইয়ের ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল নান্টু। হঠাৎ পিঠে কার হাত পড়তেই চমকে উঠে, ফিরে দেখে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু। নান্টু কিছু বলার পূর্ব্বেই মন্টু কেঁদে ফেলে।

—"মন্টু ভাই, তুই আমাকে ক্ষমা কর।

—কি হয়েছে মন্টু ? নান্টু অবাক।

—তোর কলি মরে গ্যাছে নান্টু। আজকে স্বীকার করছি আমরাই ওকে নিয়েছিলাম।

—কি, কি বললি ? নান্টু ক্ষেপে ওঠে। প্রতিহিংসায় ওর চোখ দু'টো পিট্ পিট্ করতে থাকে। এখুনি ও হয়তো ঝাপিয়ে পড়বে মন্টুর ওপর। ছিঁড়ে দেবে ওর অক্ষত দেহখানা। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভেসে এলো। —কু—হু—উ, কু—হু—উ, কু—হু—উ! সুমধুর সেই কণ্ঠস্বর। মন্ত্র মুগ্ধের মত নান্টু এগিয়ে যায় জানালার কাছে। বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে বসে ডাকছে একটি ছোট্ট কোকিল। ... মুক্তোর মতো ঝক্ ঝক্ করছে ওর চোখ দু'টো। পলকহীন চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে নান্টু। সে দৃষ্টিতে নেই কোন ভাষা। বোবা কান্না শুধু গুমরে মরছে মনের কোন গোপন মনি কোঠায়!



পাকিস্তান সবুজ সেনা

জালাল ভাইয়ের চিঠি

সবুজ সেনার ভাই-বোনেরা,

প্রীতি জানিয়ে আমাদের নিজস্ব মুখপত্রের মাধ্যমে এই সর্বপ্রথম তোমাদের লেখার সুযোগ পাচ্ছি। আমাদের মুখপত্রের যে যাত্রা আজ শুরু হোলো, সে যাত্রা যেনো কোনো বাধাবিপত্তির কাছে হার না মেনে অব্যাহত থাকে—এই আমাদের সাধনা।

আজ থেকে তিন বছর আগে প্রদেশের অন্যতম কিশোর আন্দোলন হিসেবে পাকিস্তান সবুজ সেনার জন্ম। প্রদেশের কিশোরদের সংগঠিত করে তাদের জন্য মিলিত কর্মসূচী গ্রহণের মারফৎ একযোগে কাজ করে যাওয়াই সবুজ সেনা আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি—প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই আমাদের দেশের কিশোর সমাজের অবস্থা প্রীতিপ্রদ নয়। তাদের সহজাত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভের মতো যথোপযুক্ত পরিবেশও আমাদের দেশে নাই। তাই নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অনুকূল পরিবেশ, সৎসংসর্গ ও প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির জন্যে কিশোর সমাজের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই কয় বছর সবুজ সেনা যা করেছে, তা মোটেও অবহেলাযোগ্য নয়। এর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, মুনশিগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠানের শাখা গঠিত হয়েছে।

কিশোর কল্যাণমূলক কার্য্যে নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আর্থিক সাহায্য দান করে এর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দান করেছে।

একথা ঠিক যে, সবুজ সেনা আন্দোলন এখনও সাংগঠনিক পর্য্যায়ে। পূর্ণাঙ্গ কিশোর আন্দোলন হিসেবে এখনও সবুজ সেনা গড়ে উঠতে পারেনি নানা বাধাবিপত্তি ও অসুবিধার জন্যে। যে সব জায়গায় শাখা গঠিত হয়েছে, তাদের কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়নি। কিন্তু একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে, যদি তার কর্মীরা আন্তরিক নিষ্ঠা, দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল সাধনার সাথে কাজ করে যায়। আমি আশা করি সবুজ সেনার কর্মীরা নিজেদের সুকঠিন সাধনায় জয়যুক্ত হবে।

পরিশেষে প্রদেশের কিশোর ভাইবোনদের কাছে আমার আবেদন এই যে, নিজেদের জন্য উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তারা যেন একযোগে কাজ করতে এগিয়ে আসে। পাকিস্তান সবুজ সেনা পূর্ণাঙ্গ কিশোর আন্দোলন হিসেবে অদূরেই গড়ে উঠবে—এ আশা করে আজ এখানেই শেষ করছি। ইতি—

জালাল ভাই
প্রধান সংগঠক

খবর

ঢাকা শহর সবুজ সেনা সম্মেলন

ঢাকা শহর সবুজ সেনা সম্মেলন মে মাসের ১৭ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে পাকিস্তান সবুজ সেনার ঢাকা শহরের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিগণ যোগদান করবেন। সম্মেলনে পাকিস্তান সবুজ সেনার ঢাকা শহর কর্ম পরিষদ গঠিত হবে ও ঢাকায় আরও শাখা গঠন এবং বিভিন্ন শাখার সাধারণ সমস্যা ও উহাদের সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ঢাকার বর্দ্ধমান হাউসে সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

ঢাকা জেলা সবুজ সেনা সম্মেলন

ঢাকা জেলা সবুজ সেনা সম্মেলন আগামী মে মাসের ২৪শে তারিখে মুনশীগঞ্জে ঢাকা জেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে সবুজ সেনার প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগ দেবেন। সম্মেলনে পাকিস্তান সবুজ সেনার ঢাকা জেলা কর্মপরিষদ গঠিত হবে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও কর্মসূচী প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

প্রাদেশিক সবুজ সেনা সম্মেলন

পাকিস্তান সবুজ সেনার প্রাদেশিক সম্মেলন আগামী জুন মাসের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাপক আয়োজন চলছে। সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিগণ যোগদান করবেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সহ তিনটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, দুইটি আলোচনা সভা ও প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভা দুটিতে কিশোর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য পন্থা প্রভৃতি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও প্রতিনির্নিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।



ক্রিকেট কোচিংএ সবুজ সেনা

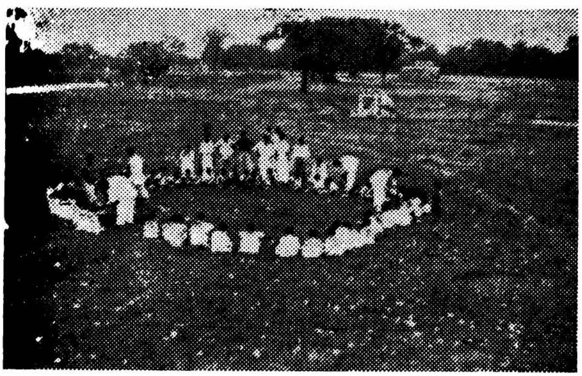
এ ছাড়াও সম্মেলন উপলক্ষে যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটি "আন্তস্কুল সাংস্কৃতিক প্রতি-যোগিতা" উল্লেখযোগ্য। এই প্রতি-যোগিতায় আবৃত্তি, বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় থাকবে ও স্কুলের যে কোন ছাত্রছাত্রী এতে যোগ দিতে পারবে।

সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অবলম্বিত হবে। সম্মেলনের পূর্বে সাংগঠনিক ব্যাপারে কাজ করার জন্যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় সদস্যেরা বিভিন্ন জেলা সফর করবেন।

সবুজ সেনার প্রধান সংগঠক জালাল ভাই মে মাসে সিলেট, বরিশাল, চাঁদপুর ও কুমিল্লা এবং অন্যতম সংগঠক কাসেম ভাই উক্ত সময়েই বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী সফর করবেন।

উর্দু রোড সবুজ সেনা

পাকিস্তান সবুজ সেনা ১৯৫৩ সালে যে ৪টি ইউনিট নিয়ে জন্ম নিল, তাদের মধ্যে উর্দু রোড ইউনিট অন্যতম। সে সময় থেকে সুযোগ্য পরিচালনায় এই ইউনিটটি পুষ্টিলাভ করে। মাঠের কাজের ভিতর ইহার কার্য্যাবলী সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন—প্যারেড, পিটি, ব্রতচারী ব্যায়াম ও খেলাধূলা। এছাড়া ৪৭ নম্বর আজগর লেনে ইহার একটি ছোটখাটো লাইব্রেরীও ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরে লাইব্রেরীটি ভেঙ্গে যায়। তখন নিউ উর্দু স্পোর্টিং ক্লাব নামে ইহার ফুটবল টিমও ঢাকার মাঠে ছোটদের মাঝে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।



সবুজ সেনা সদস্যদের বনভোজন

এবছর জানুয়ারী মাসে এই ইউনিটের সদস্যগণ ও উর্দু সোশ্যাল ক্লাবের সদস্যগণ এক সমঝোতায় উপনীত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে স্বীকৃত হয়। সে সময় হতে তিন মাসের অল্প সময়ে উভয়ে মিলিতভাবে নিম্নোক্ত কাজ সমূহ সমাধা করে।

(১) এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে উর্দু রোডে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

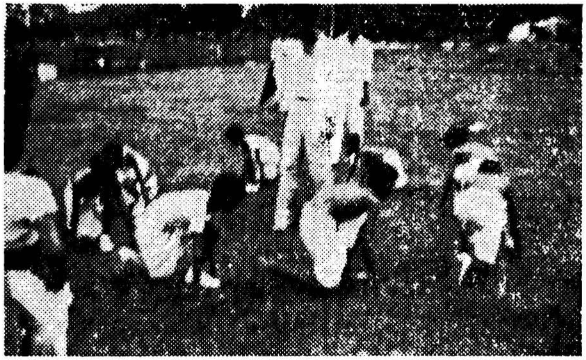
(২) এবছর ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান রেডক্রসের মাধ্যমে পূর্ব্ববর্ত্তী ঠিকানায় দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়।

(৩) এবছর মার্চ্চ মাসে ৩নং আজগর লেনে ইহার নিজস্ব অফিস স্থাপন করা হয়।

(৪) ১লা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় সবুজ সেনার সভাপতি জনাব এম ই, খান চৌধুরীকে উর্দ্দু রোডে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

(৫) ৭ই এপ্রিল বিশ্ব-স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপলিটির পরিচালনাধীনে ইহার সদস্যগণ এই এলাকার রাস্তা সমূহ ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার করে।

(৬) ঢাকার এই এলাকায় বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মিউনিসিপলিটির পরিচালনায় ইহার কর্ম্মীগণ টীকা দেওয়া অভিযান আরম্ভ করে।



খেলাধূলায় সবুজ সেনা

(৭) পাকিস্তান সিভিল ডিফেন্সের পরিচালনায় ইহার কর্ম্মীগণ First Aid কোর্সের শিক্ষা গ্রহণ করছে।

ইহার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিন জন সদস্য সহ জনাব শফিকুল আমিনকে চেয়ারম্যান ও সৈয়দ কিশোয়ার হোসেনকে কনভেনার করিয়া একটি সাব কমিটি গঠন হয়। কার্য্যতঃ এই সাব কমিটির চেয়াম্যান ও কনভেনার উর্দ্দ রোড সবুজ সেনা ইউনিটের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে কাজ করছেন।

—ফজলুর রহমান (ভোলা)

———